নবীজির হজ্জ

শায়খ আবদুল্লাহ আল-বারনী আল মাদানী

অনুবাদ- উম্মে আবদুর রহমান

সম্পাদনা- মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

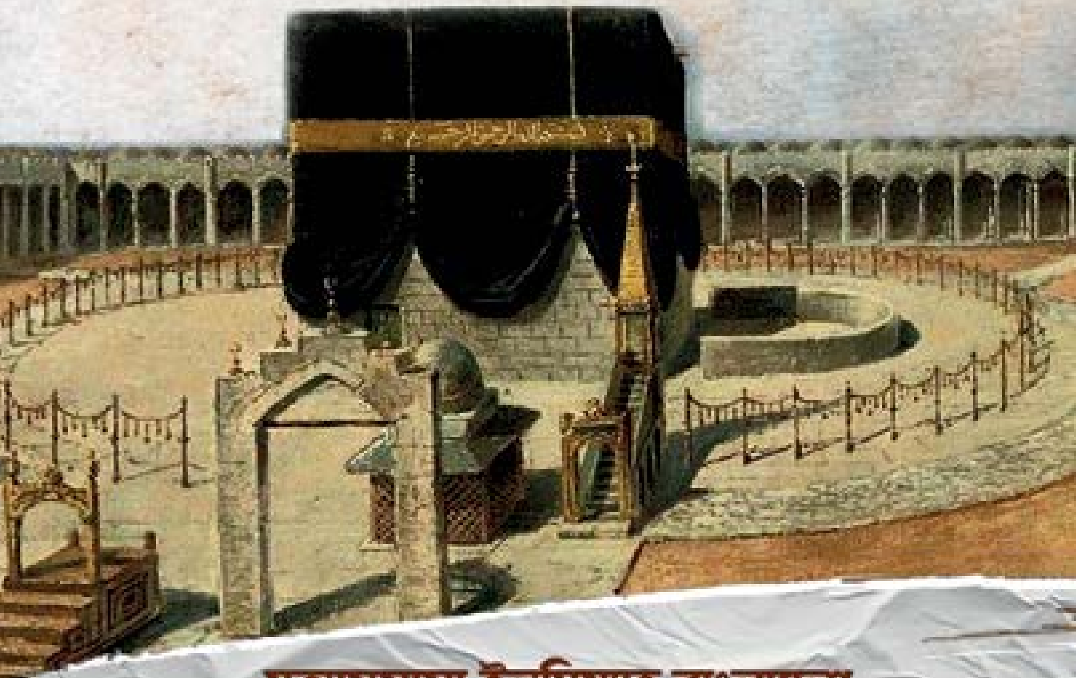

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

নবীজীর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হজ

নবীজীর হজ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[বিদায় হজের ধারাবাহিক সরল বিবরণ]

শায়খ আবদুল্লাহ আল-বারনী আল-মাদানী

[হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক এলাহী
বুলন্দশহরী মুহাজিরে মাদানী রহ. -এর পুত্র]

অনুবাদ

উম্মে আবদুর রহমান

সম্পাদনা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উসতাযুল হাদীস : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

নবীজীর হজ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী

মে ২০২৩ ঈসায়ী

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক কোনো প্রকার বিকৃতিসাধন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Nobizir Hajj By Shaikh Abdullah Al-Barni Al-Madani, Translated By Umme Abdur Rahman, Published By Muassasa Ilmiyah Bangladesh.

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

প্রকাশক

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

: 01871746798

: 01830540520

/ MuassasaIlmiyahbd

মহানগর প্রজেক্ট, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা

mibd.org

প্রকাশকের কথা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে হজ করেছিলেন, তা জানতে কার না ইচ্ছে করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একবারই হজ করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁর সে হজ 'বিদায় হজ' নামে প্রসিদ্ধ। দীদারে বাইতুল্লাহর সময় মাহবুবে খোদার মনের কী অবস্থা ছিল, তা তো আলিমুল গাইব-ই বলতে পারেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে কেমন ছিল তাঁর সে প্রেমসিক্ত হজ, এর বিবরণী পাওয়া যায় নবীজির প্রাণপ্রিয় সাহাবীদের জবানীতে। তন্মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. এর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় জাবের রাযি.-র বর্ণনা অবলম্বনে বিদায় হজের ধারাবাহিক সরল বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে।

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

নবীজির বিদায় হজের বিবরণ উম্মতের জন্য অত্যন্ত গুরুবহ। হজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, রূহানিয়াত ও বিধি-বিধান জানার জন্য বিদায় হজ মূল উৎস। এজন্য যুগে যুগে বাইতুল্লাহর আশেকগণ বিদায় হজের বিবরণ স্ব স্ব ভাষায় লিখেছেন ও পড়েছেন। সর্বোপরি এর রঙে নিজেদের হজের সফরকে রাঙিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু বাংলা ভাষায় বিদায় হজের বিবরণ সম্বলিত নির্ভরযোগ্য স্বতন্ত্র বই অপ্রতুল। তাই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল। আলহামদুলিল্লাহ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির মাধ্যমে সে দাবি অনেকাংশে পূরণ হয়েছে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী।

এ গ্রন্থের মূল লেখক হলেন শায়খ আবদুল্লাহ আল-বারনী, যিনি উপমহাদেশের

বিখ্যাত মনীষী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী রহ এর সুযোগ্য সাহেবযাদা। গ্রন্থটি অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ এর কর্ণধার, স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রাণপুরুষ হযরতুল উসতায মাওলানা তাহমীদুল মাওলা হাফিযাহুল্লাহ। আনন্দের বিষয় হলো, স্বয়ং উসতাযে মুহাতারামের পরিবার থেকেই অনুবাদ কর্ম সম্পাদন হয়েছে। আল্লাহ তাআলা উসতাযে মুহতারাম ও তাঁর পরিবারকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন, উম্মতের কল্যাণে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইতিপূর্বে এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ লাভে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ পরিবার আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করছে।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর পক্ষে
বান্দা আব্দুল্লাহ সুহাইব
২৩ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী
১৪ মে ২০২৩ ঈসায়ী

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

অনুবাদের কথা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উসতায, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

২০১২ ইংরেজী সালে আমার প্রথম উমরার সফর। মক্কা মোকাররমায় হযরত মাওলানা আব্দুল হাফিজ মাক্কী সাহেবের খানকায় হযরতের সাথে মোবারক সাক্ষাতের সুযোগ হল। হযরতের অবাক করণীয়া আচরণের এক পর্যায়ে হযরত আমার হাতে কয়েকটি মূল্যবান কিতাব স্বহস্তে তুলে দিলেন। এতে একটি রিসালা ছিল– 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে কায়সে হাজ্ব কিয়া'। গ্রন্থকার আব্দুল্লাহ আল-বার্নী। তিনি মুহাজিরে মাদানী হযরত মাওলানা আশেকে এলাহী বার্নী (র.) (মৃত. ১৪২২ হিজরী) এর সুযোগ্য পুত্র। তাঁর এ কিতাবটির নাম ও বিষয়বস্তু আমাকে আকর্ষণ করল প্রবলভাবে। একই সফরে মুহতারাম ড. আব্দুল্লাহ নযীর আহমদের পবিত্র হাদিয়া পেলাম–'আল-বাহরুল আমীক' – হজ্ব বিষয়ে তিন সহস্রাধিক পৃষ্ঠার পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থ। তারপর নবীজীর হজ্ব বিষয়ে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (র.) এর 'হাজ্জাতুন নাবিয়্যি ওয়া উমুরাতুহ' নামক মহামূল্যবান আরবী গ্রন্থটিও এক তালিবুল ইলম ভায়ের সুবাদে নছীব হল এবং মোটামুটি পড়ারও সুযোগ হল। কিন্তু বিভিন্ন বিচারে উর্দু ভাষায় রচিত ছোট্ট রিসালাটি আমার কাছে বড় ভাল লাগল। ২০১৩ ইংরেজী সালে আল্লাহ তা'আলা খাছ মেহেরবানী করে আবারও উমরার সফরের

সুযোগ করে দিলেন। আমার স্ত্রী সফরের প্রস্তুতিতে আমাকে অনেক সহযোগিতা করল। যাবারকালে তার মাঝে আল্লাহর ঘর দেখার অদম্য আগ্রহ দেখতে পেয়ে রিসালাটি বের করে তার হাতে দিলাম। বললাম– অবসরে এটি তরজমা কর, আল্লাহ তা'আলা এর উসীলায় তোমার বাইতুল্লাহ দেখার সাধ পূরণ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ্। এক মাসের সফর থেকে ফেরার পর আমি প্রায় ভুলেই গেছি। কিন্তু সে আমাকে অবাক করে দিয়ে জানাল– কাজটা তো আমি করে ফেলেছি! আমি বলি আল-হামদুলিল্লাহ। এরপর অনেকদিন চলে গেল আমি তার এ কাজের যথাযথ কদর করতে পারিনি। আকারে ছোট অথচ বিষয়বস্তুতে মহান এ পাণ্ডুলিপিটা এমনিতে পড়ে ছিল। এর মধ্যে তার বাইতুল্লাহ যিয়ারতের আগ্রহ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। তার যিয়ারতে বাইতুল্লাহ্র উদগ্র বাসনা ও আলোচনা-পরিকল্পনা-দোয়া দেখতে দেখতে আমাদের সোনামনি বাহ্‌জা ও আব্দুর রহমানের সার্বক্ষণিক আবদার হয়ে উঠল– আমরা কবে বাইতুল্লাহ যাচ্ছি? তাদের বয়স এখনো ছয়ের কোঠা পার হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ বইয়ের অনুবাদিকা ও সন্তানদ্বয়ের তীব্র আকাঙ্খা ও দোয়ার বরকতে এপ্রিল ২০১৬ ইংরেজিতে আল্লাহ তা'আলা আবারও আমাকে সপরিবারে বাইতুল্লাহ যিয়ারতের সৌভাগ্য নসীব করেন। আমার মনে হল এবারের এ নসীব তার উসীলায়ই পেয়েছি। তাই মনে হল তার অনুদিত বইটি প্রকাশ করা আমার উপর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এদিকে নবীজী জীবনে হজ্ব করেছেন মাত্র একবারই। হজের যাবতীয় বিধি-বিধানের মূল উৎস সব এ সফরের বিবরণেই পাওয়া যায়। নবীজীর এ হজ্ব উম্মতের জন্য সবিশেষ গুরুত্ব রাখে। তাই সব শ্রেণীর পাঠকের জন্যই বিষয়টি বেশ উপকারি বলে মনে হল। বিষয়ের গুরুত্বের বিবেচনা করে অবশেষে আল্লাহ তা'আলার তাউফিকে অনুবাদ কর্মটিকে আমার সাধ্যমত কিছুটা ঠিক-ঠাক করে বই আকারে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার প্রয়াস পেলাম। মূল গ্রন্থকারের শেষ কথাটি আমাকে যুগিয়েছে শক্তি। আমাকে করেছে আশান্বিত। তিনি লিখেছেন– 'আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া তিনি তাঁর এ অধম বান্দাকে এ পবিত্র বিবরণ লেখার তাউফিক দিয়েছেন'। আমাদেরও একই কথা। আল্লাহ কবুল করে নিন। অবশ্য এ পুস্তিকা পাঠের বেশি ফায়দা ও মজা তিনিই উপলব্ধি

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

করতে পারবেন যিনি নির্ভরযোগ্য বই পুস্তকের সহযোগিতায় হজের নিয়ম নীতি ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলোও ভালভাবে জেনে নিবেন।

সবশেষে শুকরিয়া জানাচ্ছি মাকতাবাতুল আশরাফ এর সত্ত্বাধীকারী যুগসচেতন রুচিশীল আলেম মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবকে। তিনি পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে বাধিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।[১]

তাহমীদুল মাওলা
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা
০৬. ১১.১৪৩৭ হিজরী
১০.০৮.২০১৬ খৃস্টাব্দ

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

[১] প্রথম সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে এ ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল।

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিধি-বিধান বিষয়ে যেমন মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছেন তেমনি নিজে আমল করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই নামায, রোযা, হজ এবং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলী নমুনা সামনে রাখা জরুরি। ফুকাহায়ে কেরামও নবীজীর (মৌখিক ও কর্মগত) সকল হাদীস সামনে রেখে তবেই বিধি-বিধান বিন্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন– এটি ফরজ, এটি ওয়াজিব, এটি সুন্নত ও এটি মুস্তাহাব।

হজের মাসাইল বিষয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক লিখেছেন। তা থেকে উপকৃত হওয়ার বিকল্প নেই। অধম এ কিতাবে শুধু নবীজীর হজের বিবরণ ও বিদায় হজের ঘটনাবলী উল্লেখ করেছি।

ঈমান ও মুহাব্বাতের দাবীই হল নবীজীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করা। কবির ভাষায়–

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

নবীজীর পদচিহ্নই জান্নাতের পথ। সুন্নাতের পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

এ কিতাবে নবীজীর হজের বিবরণ বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে। হজ্ব আদায়ের সময় যদি তা সাথে রেখে পড়া যায় তাহলে ইন-শা-আল্লাহ হজের প্রাণ ও বরকতসমূহ প্রবলভাবে চোখে পড়বে এবং উপলব্ধি হবে। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (আশেকে এলাহী বার্‌নী) (রহ.) রচিত 'তরীকায়ে হজ ও উমরাহ ও যিয়ারত' পুস্তিকাটি এ কিতাবের শেষে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যাতে হজের মাসাইল বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।[১] যারা এ কিতাব থেকে উপকৃত হবেন আশাকরি অধমের জন্য কল্যাণের দোয়া করতে ভুলবেন না। বিশেষভাবে আরাফার ময়দানে আমার জন্য উভয় জাহানের মুক্তি আর রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হজ্বে মাবরূর দান করেন এবং আমাদের সকলকে আওলিয়ায়ে কেরামের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন।

وبالله التوفيق وهو خير عون وخير رفيق.

আবু আহমদ আব্দুল্লাহ আল-বারনী আল-মাদানী
বিন মুফতী আশেকে এলাহী মুহাজিরে মাদানী (রহ.)
শাবান ১৪২৪ হিজরী, মদীনা মুনাওয়ারা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

[১] সংক্ষিপ্ততার বিবেচনায় অনুবাদের সাথে উক্ত কিতাবটি যুক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে কোন সুযোগে এটিও অনুবাদ করে পাঠক সমীপে পেশ করা হবে ইন-শা-আল্লাহ।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৫

অনুবাদের কথা ৭

লেখকের ভূমিকা ১০

বিদায় হজ (দশম হিজরী) ১৫

হজ গমনের সাধারণ ঘোষণা ১৫

মদিনা তায়্যিবা হতে রওয়ানা ১৫

যুলহুলাইফায় অবস্থান গ্রহণ ১৬

ইহরামের গোসল ১৬

কুরবনীর পশুতে ইশ'আর (বিশেষ চিহ্ন দেওয়া) ১৬

ইহরাম ও তালবিয়া ১৬

মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ ১৭

মসজিদুল হারামে প্রবেশ · ১৮

ক্বাবা শরীফের তাওয়াফ · ১৮

তাওয়াফের দু'রাকাত আদায় ১৯

সাফা-মারওয়ায় সাঈ ২০

মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান ২১

মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মিনা যাত্রা ২১

নয় যিলহজ আরাফায় অবস্থান ·· ২১

বিদায় হজের ভাষণ ২৩

নিয়ামত পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা ২৬
আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ ও দোয়া ২৭
যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় ২৭
মাসআলা ২৭
আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ ও দোআ ২৭
মুযদালিফার পথে ২৮
মাগরিব ও ইশার নামায ২৮
ফজরের নামায আদায় ও আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ·· ২৮
মুযদালিফা থেকে মিনার পথে ২৯
ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সির- আসহাবে ফীলের ধ্বংসস্থল · ২৯
মিনায় পৌঁছে জামরাতুল আক্বাবার রামি· ২৯
কুরবানী · ৩০
হলক ও মাথা মুণ্ডন ৩১
তাওয়াফে যিয়ারত ৩১
তাওয়াফের পর প্রথমে যমযম পান ৩১
আবে যমযমের ফযীলত ও বরকত ৩২
তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ ৩৫
মিনায় প্রত্যাবর্তন ৩৫
১১ই যিলহজ্বে রামি ৩৬
মিনায় নবীজীর দ্বিতীয় খুৎবা ৩৬
মিনায় অবস্থানকালে রাতে মক্কায় আগমন ৩৭
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া ত্যাগের ইঙ্গিত ৩৭
১২ ও ১৩ যিলহজে 'রামি' ৩৭

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

বিদায়ী তাওয়াফ ৩৮
মদীনা তায়্যিবার পথে ৩৮
গাদীরে খুম্ম এর খুৎবা ৩৮
উমরের পক্ষ থেকে আলীকে মোবারকবাদ ৩৯
যুল-হুলাইফায় রাত্রিযাপন ৩৯
মদীনা দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ ৪০

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

বিদায় হজ্ব
(দশম হিজরী)

হজ্ব কত সালে ফরজ হয়েছে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) দশম হিজরীতে হজ্ব ফরজ হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ যদি এর আগেই হজ্ব ফরজ হত তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করতে বিলম্ব করতেন না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমও এ মতকে সঠিক বলে সমর্থন দিয়েছেন।[১]

হজ্ব গমনের সাধারণ ঘোষণা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশম হিজরীতে হজ্ব করার নিয়ত করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন। মদীনা তায়্যিবার আশপাশ থেকে আগত নবীজীর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী যে কাফেলা তাঁর সাথে হজ্ব করার জন্য মদীনায় পৌঁছেছিল তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক। রওয়ানা হওয়ার আগেই মদীনার রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য হযরত আবু-দুজানা (রা.) কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। কোন কোন বর্ণনায় হযরত সিবা ইবনে উরফুত্বার কথাও পাওয়া যায়।

মদিনা তায়্যিবা হতে রওয়ানা

দশম হিজরীর পঁচিশে যুলকা'দায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তায়্যিবা থেকে হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন– যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রা করেন তখন যুলকা'দার পাঁচ দিন বাকি ছিল।[২] হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১] যাদুল মা'আদ ৩/৫৯৫
[২] বুখারী ও মুসলিম

যোহরের চার রাকাত মদীনা তাইয়্যিবায় আদায় করলেন। অতঃপর চুল পরিপাটি করে তেল দিলেন।

যুলহুলাইফায় অবস্থান গ্রহণ

যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তায়্যিবা থেকে যাত্রা করলেন। যুলহুলাইফায় [১] পৌঁছে আসরের নামায কসর অর্থাৎ দুই রাকাত আদায় করলেন। রাতে এখানেই অবস্থান করলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ইশা এবং পরের দিনের ফজর ও যোহর যুলহুলাইফায় আদায় করলেন। এ সফরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ তাঁর সাথে ছিলেন।

ইহরামের গোসল

সুনানে তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের কাপড় বাঁধার পূর্বে গোসল করলেন। গোসল শেষ হলে হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর শরীর ও মাথা মুবারকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। যার চিহ্ন নবীজীর দাড়ি ও মাথা মুবারকে চকচক করছিল।[২] আর এ সুগন্ধি ছিল মেশক ও যারীরাহ (–যা এক প্রকারের সুগন্ধিচূর্ণ)। [৩]

কুরবানীর পশুতে ইশ'আর করা (বিশেষ চিহ্ন দেওয়া)

অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুগুলোর গলায় 'ক্বিলাদা' (চামড়ার মালা) পরিয়ে দিলেন। উটগুলোর কুঁজের ডান পাশে সামান্য কেটে যে রক্ত বের হল তা তার গায়ে মেখে দিলেন। পরিভাষায় একে 'ইশ'আর' বলা হয়। ইশ'আর করার উদ্দেশ্য হল, যাতে একে কুরবানীর পশু বলে চেনা যায়।

ইহরাম ও তালবিয়া

তারপর হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন।[৪] অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে ক্বিবলামুখী হয়ে

[১] পরবর্তীতে যার নাম হয়েছে– আবইয়ারে আলী।
[২] সুনানে তিরমিযী
[৩] সহীহ মুসলিম, আসসুনানুলকুবরা -বাইহাকী
[৪] শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৮/১৪৫

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

বসলেন। ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করলেন। তালবিয়ার শব্দগুলো নিম্নরূপ–

لَبَّيْكَ اَللّٰهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

> "আমি হাজির! ওগো আল্লাহ আমি হাজির! আমি হাজির! তোমার কোন শরিক নেই, আমি হাজির! সমুদয় প্রশংসা তোমার, সমস্ত নিয়ামত তোমার এবং সকল রাজত্বও তোমার। তোমার কোন শরীক নেই"।[১]

তালবিয়ার শব্দগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই বুঝে আসে যে মানুষ তাওহীদের সাগরে নিমজ্জিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন এবং সাহাবাদেরও উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়তে বললেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের নফল নামায আদায় করার পর প্রথম তালবিয়া পড়লেন। অতঃপর বাহনে চড়ে আবারও তালবিয়া পড়লেন। তারপর যাত্রা শুরু করলেন এবং বায়দা নামক পাহাড়ে চড়ে তৃতীয় বার তালবিয়া পড়লেন। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবায়ে কেরাম যে যখনই নবীজীর পবিত্র 'যবান' মোবারক থেকে প্রথম তালবিয়া পড়তে শুনেছেন তিনি সেটাকেই নবীজীর প্রথম তালবিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উলামায়ে কেরামগণ এর ধারাবাহিকতাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ

মুমিনদের এ কাফেলা ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতত্বে উচ্চস্বরে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদীতা ও নিজেদের দাসত্বের ঘোষণা করতে করতে চলতে থাকলেন। যুলহিজ্জার চার তারিখে 'যু-তূয়া'[২] উপত্যকায় পৌঁছলেন। যা ছিল মক্কা মুয়াজ্জমার একেবারেই সন্নিকটে। অতঃপর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করলেন। 'হারামে মক্কায়' (মক্কার হারাম অঞ্চলে) প্রবেশ করার জন্য গোসল করলেন এবং 'সানিয়্যাতুল উল্ইয়া' এর দিক দিয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করলেন।[৩]

---

[১] সহীহুল বুখারী, সুনানে নাসাঈ

[২] 'যু-তূয়া'– (ذو طُوَى)

[৩] বর্তমান সময়ে সানিয়্যাতুল উলইয়াকে 'ম'আবিদা' বলা হয়।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

দিনের প্রথম প্রহরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবুস্-সালাম দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। তাঁর দৃষ্টি বাইতুল্লাহর উপর পড়া মাত্রই তিনি আল্লাহু আকবার বলে এ দু'আটি পড়লেন–

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا.

"হে আল্লাহ আপনিই কেবল সমস্ত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। আপনিই মুক্তি ও শান্তির মালিক। তাই মাওলা আপনি আমাদের শান্তিময় জিন্দেগী দান করুন। হে আল্লাহ আপনি এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা, মহত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করে দিন। হজ্ব ও উমরাকারীদের মধ্যে থেকে যে এই ঘরকে সম্মান করে তার সম্মান, মর্যাদা, মহত্ব ও কল্যাণ বাড়িয়ে দিন"।[১]

ক্বাবা শরীফের তাওয়াফ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার পর তাওয়াফ করলেন। তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত পড়েননি। কেননা তাওয়াফই মসজিদুল হারামের 'তাহিয়্যাহ্' (তাওয়াফ করার উদ্দেশ্য না থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তাতে চুমু খেলেন। অতঃপর তাওয়াফ শুরু করলেন। 'রুকনে ইয়ামানী' এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দোয়া পাঠ করলেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الأٰخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের রব, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যান দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" [সূরা বাকারা, আয়াত নং ১০২]

---

[১] আসসুনানুল কুবরা– বাইহাকী (৫/১৫৮)

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রামল' করলেন। 'রামল'– অর্থ হল ছোট ছোট পা ফেলে দৌড়ের মত চলা এবং কাঁধকে বীরের মত নাড়াতে থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিবাও করেছেন। অর্থাৎ ডান কাঁধকে খোলা রেখে চাদরের উপরের অংশকে ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করেননি। বরং এতে শুধু হাত লাগানোই সুন্নত। চুম্বন করার কথা প্রমাণিত নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছলে ভিড়ের কারণে শুধু সেদিকে হাত দিয়ে ইশারা করতেন অথবা লাঠি বা হাতকে হাজরে আসওয়াদে লাগিয়ে তাতেই চুমু খেতেন। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করলেন।

তাওয়াফের দু'রাকাত আদায়

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মাকামে ইবরাহীমে' আসলেন এবং তার সামনে কিবলাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও ক্বাবা শরীফের মাঝে রেখে দাঁড়ালেন। এখানে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى.

> তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও। [সূরা বাক্বারা আয়াত নং ১২৫)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুত-তাওয়াফ আদায় করলেন– যা প্রত্যেক তাওয়াফের পর আদায় করা ওয়াজিব।[১]

সাফা-মারওয়ায় সাঈ

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা অভিমুখী হলেন। সাফা পাহাড়ের নিকট পৌঁছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

[১] যাদুল মা'আদ ২/২২৫-২২৭

"নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত"। [সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৫৮]

অতঃপর বললেন– আল্লাহ তা'আলা আয়াতে যা দিয়ে শুরু করেছেন আমরাও তা থেকেই সাঈ শুরু করব। (অর্থাৎ আয়াতে প্রথমে সাফার কথা এসেছে তারপর মারওয়ার কথা। তাই আমরা সাফা থেকে সাঈ শুরু করব।)

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে এতটুকু উঠলেন যেখান থেকে কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হয়। কাবা অভিমুখী হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হামদ-সানা পাঠ করলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে এ কালিমাগুলো পড়লেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আধিপত্য তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। (কাফেরের) সব দলগুলোকে তিনিই পরাজিত করেছেন"।

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

তিনবার এ শব্দগুলো পাঠ করলেন এবং আরও দোয়া পড়লেন। অতঃপর সাঈ শুরু করে দিলেন এবং সাফা থেকে মারওয়ার দিকে চললেন। মধ্যবর্তী স্থান খুব দ্রুত অতিক্রম করলেন এবং বাকি জায়গাটুকু সাধারণ ভাবেই চললেন। এভাবে যখন মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন তখন কাবা অভিমুখী হয়ে তাকবীর বললেন ও আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও আজমত বর্ণনা করলেন। সাফার মত মারওয়াতেও দোয়াগুলো পাঠ করলেন। অতঃপর পুনরায় সাফার দিকে যাত্রা করলেন। এভাবেই সাত চক্কর পূর্ণ করলেন। অর্থাৎ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় এক চক্কর। এভাবে মারওয়ায় সপ্তম চক্কর শেষ হয়।

মক্কা মু'আজ্জমায় অবস্থান

সাঈ পূর্ণ করার পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম খুলেননি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ্ব ছিল 'ক্বিরান'। তবে সাহাবায়ে কেরামকে মাথার চুল ফেলে দিতে বা খাটো করে ইহরাম খুলে ফেলার আদেশ করলেন এবং বললেন 'যদি আমি পরে কি হবে তা আগেই জানতাম তাহলে 'হাদী' (অর্থাৎ কুরবানীর পশু) সাথে আনতাম না'।[১] চার যিলহজ্ব থেকে আট যিলহজ্ব পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামায় অবস্থান করলেন। এখানে অবস্থানকালে কাবা শরীফের দরজায় খুৎবাও দিলেন।

মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে মিনা যাত্রা

আট যিলহজ্ব সকালে সূর্য উপরে উঠার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ 'মিনা'র দিকে যাত্রা করলেন। মিনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন এবং রাতে সেখানেই অবস্থান করলেন।[২] রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইয়াউমুত তারবিয়াহ্' অর্থাৎ আট যিলহজ্ব একটি খুৎবা দিলেন– যাতে লোকদেরকে হজের বিধি-বিধান শিক্ষা দিলেন।[৩]

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

নয় যিলহজ্ব আরাফায় অবস্থান

নয়ই যিলহজ্ব ফজরের নামাজ আদায় করার পর যখন সূর্য উঠে গেল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা থেকে আরাফার দিকে যাত্রা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম তালবিয়া ও তাকবীর বলতে বলতে দু'জাহানের সরদার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আরাফার ময়দানে পৌঁছলেন। আরাফার পূর্ব দিকের একটি স্থানের নাম 'নামিরা'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাবুটি সেখানে স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। (বর্তমানে সেখানে সুপ্রশস্ত ও সুবিশাল মসজিদ

---

[১] সহীহুল বুখারী
[২] যাদুল মা'আদ ২/২৩৩
[৩] উয়ূনুল আসার ২/৩৬২

নির্মাণ করা হয়েছে যাকে মসজিদে নামিরা বলা হয়। এখান থেকেই হজের ইমাম খুৎবা দিয়ে থাকেন।)

সূর্য ঢলে যাওয়ার পর অর্থাৎ যোহরের নামাজের সময় হওয়া পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উষ্ট্রীতে আরোহন করে 'বাতনে ওয়াদি'তে আসেন এবং সেই ঐতিহাসিক খুৎবা প্রদান করেন যা ইতিহাসে 'খুৎবায়ে হজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজের ভাষণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

বিদায় হজ্জের ভাষণ

নবীজী প্রথমেই হামদ-সানা পাঠ করলেন। নিজের নবুওত ও রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ের সাক্ষ্য নিলেন। অতঃপর তাকওয়া অবলম্বন করার অসিয়ত করলেন এবং দুনিয়া থেকে শীঘ্রই তাঁর বিদায় নেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন–

> أيها الناس! إني لا أراني وإياكم نجتمع في هذا المجلس أبدا.
>
> "হে লোক সকল– আমার মনে হয় তোমাদের সাথে আমি এ স্থানে আর কখনও একত্র হতে পারবনা"।[১]

মুসলমানদের পারস্পরিক মুহাব্বত ও ভালবাসা স্থাপন এবং মানুষের সম্মান-ইজ্জত ও জান-মালের হেফাজতের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বললেন–

> فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
>
> "হে লোক সকল– তোমাদের রক্ত তোমাদের অর্থ (জান-মাল) ও সম্মান-ইজ্জত একে অপরের জন্য তেমনি সম্মানিত ও পবিত্র, আজকের (আরাফার মহান) দিন এই মহান (মক্কা) নগরীতে ও এই পবিত্র (হজের) মাসে যেমন সম্মানিত ও পবিত্র। হে লোক সকল! সত্বর তোমরা তোমাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদের আপন আপন কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না– যে একে অপরের গলায় অস্ত্র চালনা করবে।[২]

---

[১] তারীখে দিমাশক ২০/৮৪

[২] বুখারী হাদীস নং ৪১৪৪

এভাবে চলমান ভাষণের এক পর্যায়ে সকল জাহেলী আইন-কানুন ও জাহেলী অর্থনীতির সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেন–

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.

"জাহিলিয়্যাতের সব কিছু আমার পদতলে পিষ্ট করছি। জাহেলী যুগের সকল রক্তপণ বাতিল ঘোষণা করছি। আমাদের পক্ষের প্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হল – ইবনে রাবীয়া ইবনুল হারিছের রক্তপণ। সে (আমাদের পক্ষীয়) বনু সা'দ গোত্রের দুগ্ধসন্তান ছিল। (প্রতিপক্ষের) হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল। (আমি এর রক্তপণ এর দাবি ছেড়ে দিলাম।)

জাহিলী যুগীয় সকল সুদ বাতিল সাব্যস্ত করা হল। আমাদের যার সুদ প্রথম বাতিল সাব্যস্ত করছি তা হল– আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর সুদ। এই সুদ পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া হল।

নারীদের সাথে সদাচারী হয়ে তাদের প্রতি জুলুম ও সীমালঙ্ঘন ত্যাগ করার আদেশ করে বললেন–

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

"হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর নামের অসীলায় তোমরা তাদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ। আল্লাহর কালামের মাধ্যমেই তোমরা তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করেছ। তাদের কাছে তোমাদের প্রাপ্য হক হল– তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না যাদের আগমনকে তোমরা অপছন্দ কর (অর্থাৎ ইযযত আবরূর যথাযথ

হিফাজত করা।) যদি এমন (অন্যায় কর্ম) করে বসে তাহলে (শাসনরূপে) তাদেরকে এতটুকু প্রহার কর (তে পার) যা (ক্ষত হয়ে যাওয়ার দরুন) প্রকাশ না পায়। তোমাদের কাছে স্ত্রীদের পাওনা হক হল– তোমরা উত্তমভাবে তাদের খানা-পিনা ও পোশাক-আশাকের ব্যবস্থা করে দেবে। (অর্থাৎ তাদের সুখ–শন্তির প্রতি যত্নবান হবে।)”

কুরআন মজীদকে হিদায়াতের উৎসমূল আখ্যা দেওয়া, নিজের উম্মতকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের আদেশ প্রদান করা, নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং যাকাত ও ফরজ হজ্ব আদায় করা এবং শাসক ও বিচারকদের অনুসরণের হুকুম দানের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন–

وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به.

“আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল, আল্লাহর কিতাব কুরআন”।

أيها الناس! إنه لا نبي بعدي، ولا أُمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلُّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وتحجون بيت ربكم، وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربكم. (رواه ابن عساكر والطبرى عن أبي أُمامة)

“হে লোক সকল! আমার পর আর কোন নবীও আসবে না এবং তোমাদের পর নতুন কোন উম্মতও সৃষ্টি হবে না। সুতরাং তোমাদের রবেরই ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, রমযানে রোযা রাখ এবং খুশি মনে মালের যাকাত আদায় কর, বাইতুল্লাহর হজ্ব কর এবং (বৈধ বিষয়সমূহে) শাসকদের আনুগত্য কর তাহলে (এর বিনিময়ে) জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[১]

এবং সব শেষে উম্মতকে সাক্ষী রেখে বলেন–

وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها

[১] ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির

إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد». ثلاث مرات. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه.

“(কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা তখন কী জবাব দেবে?

সাহাবীগণ উত্তর দিলেন– আপনি আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছেন, (রিসালত ও নবুওতের হক ও) আমানত আদায় করেছেন এবং আমাদের কল্যাণের কথা শিক্ষা দিয়েছেন।

তখন নবীজী তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলী (তর্জনী) আকাশের দিকে উঁচিয়ে আবার উপস্থিত মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন– হে আল্লাহ, শুনে রাখ (তোমার বান্দারা কি বলে) আল্লাহ সাক্ষী থাক (লোকেরা যা বলে তার উপর) আল্লাহ তুমি সাক্ষী (এরা যে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছে এর উপর)। এভাবে তিনবার বললেন”।[১]

“শুনে রাখ, যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে (আমার কথা) পৌঁছে দিও। হতে পারে যাদের কাছে পৌঁছানো হয় তাদের কেউ শ্রবণকারীদের চেয়েও আমার কথা সংরক্ষণে অধিক পারঙ্গম হবে”।[২]

নিয়ামতের পূর্ণতার ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সুমহান ঐতিহাসিক খুৎবা যারা শুনেছেন তাঁদের সংখ্যা ছিল এক লাখের চেয়েও বেশি। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ‘কাছওয়া’ নাম্নী উষ্ট্রীর হাওদায় দাঁড়িয়ে উপরিউক্ত ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। অতঃপর তখনই সেখানে এ আয়াতটি নাযিল হয়–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি

[১] সহীহ মুসলিম

[২] সহীহুল বুখারী , (রাহমাতুল লিল আলামীন)

MUASSASA ILMIAH BANGLADESH

এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম। আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে বেছে নিয়েছি”।[১]

যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দেওয়ার পর হযরত বিলাল হাবাশী (রা.) কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলাল আযান ও ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায দু'রাকাত কছর হিসেবে পড়লেন। (কারণ তিনি তখন মুসাফির ছিলেন)। অতঃপর দ্বিতীয় বার ইকামত দেওয়া হল এবং তিনি আছরের দু'রাকাত ফরজ আদায় করলেন।

প্রকাশ থাকে যে, এটা ছিল জুমার দিন । কিন্তু নবীজী জুমা পড়েননি। এ থেকেই বুঝা যায় যে যদি ইয়াউমে আরাফা জুমার দিনে হয় তবে হাজিগণ আরাফার ময়দানে জুমার নামায পড়বে না।

মাসআলা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হজের ইমাম ছিলেন। তাই তিনি ও তাঁর সাথে যাঁরা নামায পড়েছিলেন তাঁরা যোহর ও আসর একত্র করে পড়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ থেকে মাসআলা বের করলেন যে, আরাফার দিন যোহর ও আসরের নামাজ এক ওয়াক্তে একত্রে পড়ার জন্য শর্ত হল, হাজিদের ইমামে হজ্ব এর ইকতিদায় নামাজ আদায় করা। (ইমামে হজ্ব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তিনিই মসজিদে নামিরায় খুৎবা দেন এবং যোহর ও আসরের নামাজে ইমামতি করেন।)

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ ও দোয়া

নামাজের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবালে রহমতের নীচে প্রস্তরভূমিতে আসলেন। কেবলা অভিমুখী হলেন। তখন তিনি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিনয়ের সাথে কাকুতি মিনতি করে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকলেন। (অর্থাৎ প্রায় ছয় ঘন্টা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকলেন।)

আরাফার ময়দানে পড়ার মত মাসনূন দোয়া-আয্কার এ কিতাবের সাথে সংযুক্ত পুস্তিকায় (পৃ.৮৪-৮৯) বিবৃত হয়েছে।[২]

---

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩

[২] সংক্ষিপ্ততার বিবেচনায় দ্বিতীয় পুস্তিকাটি অনুবাদে যুক্ত করা হয়নি। হজের বিধি-বিধান

মুযদালিফার পথে

সূর্যাস্তের পর যখন পশ্চিম আকাশের লালিমা দূর হয়ে গেল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর সাথে উষ্ট্রীতে বসালেন এবং তাঁর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে মুযদালিফার দিকে যাত্রা করলেন। নবীজী ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন আর সাহাবীদেরকেও দ্রুত চলতে নিষেধ করলেন। স্বাভাবিক গতিতে চলতে চলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় পৌঁছলেন। পুরো পথেই তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।[১]

মাগরিব ও ইশার নামায

নবীজী মুযদালিফায় পৌঁছেই অযু করলেন এবং আযান দিতে বললেন। আযানের পর প্রথম একামত হল এবং রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। দ্বিতীয় একামত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাজ দু'রাকাত কছর আদায় করলেন। (মুযদালিফায় মাগরিব-ইশা একত্রে পড়া বিষয়ে সব আহলে ইলম একমত। এই একত্রকরণের জন্য ইমামে হজ এর ইকতিদা করা শর্ত নয়।) ইশার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন এবং সেদিন আর তাহাজ্জুদের জন্য জাগেননি, যা ছিল তাঁর সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। বরং একেবারে ফজর নামাজের জন্য জাগ্রত হন।[২]

MUASSASA

ফজরের নামায আদায় ও আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ

মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পর ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে আযান দেওয়া হল। অতঃপর ইকামত হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে উটে চড়ে 'মাশ্'আরে হারামে'র নিকট আসলেন এবং সেখানে দোয়া-মোনাজাত ও ফরিয়াদে মশগুল হয়ে গেলেন। আপন প্রতিপালকের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে স্বীয় দাসত্ব প্রকাশ করতে থাকলেন। দোয়া করতে থাকলেন। তাকবীর ও তাহলীলে নিরত রইলেন। তিনি এও ঘোষণা দিলেন যে, 'পুরো মুযদালিফার যে কোন স্থানে অবস্থান করা

বিষয়ক অন্যান্য বই থেকে দোয়াগুলো শিখে নেয়া উচিত।

[১] সহীহুল বুখারী ৩/৩০, মুসনাদে তায়ালিসী ২/১০৮

[২] যাদুল মা'আদ ২/২৪৭, উয়ূনুল আসার ৩/৩৬৪

যায়’।[১] উল্লেখ্য যে, মুযদালিফায় অবস্থানের মূল সময় হল– সুবহে সাদিক থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত। যে ব্যক্তি ঐ সময়ের মধ্যে মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তার ‘মুযদালিফায় অবস্থান’ –এর হুকুম পালন হয়ে গেল। অবশ্য মুযদালিফায় রাত ব্যাপী অবস্থান করা সুন্নত। আর সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে অবস্থান করা ওয়াজিব।

মুযদালিফা থেকে মিনার পথে

পূর্বাকাশ আলোকিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনো সূর্য উদয় হয়নি। এ সময়েই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। উষ্ট্রীতে হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন তাঁর পশ্চাদারোহী । (যিনি ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই) এবং উসামা ইবনে যায়দ (রা.) পায়ে হেটেই তাঁর সাথে সাথে চললেন। পুরো পথেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পড়া অব্যাহত রাখলেন।[২]

ওয়াদিয়ে মুহাসসির– আসহাবে ফীলের ধ্বংসস্থল

যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ওয়াদিয়ে মুহাসসির’ এর নিকট পৌঁছলেন (–যার অবস্থান মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে)। তখন তিনি তাঁর বাহনের গতি বাড়িয়ে দিলেন। যাতে ঐ স্থান তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়– যেখানে আসহাবে ফীলের উপর আযাব নাযিল হয়েছিল।[৩]

মিনায় পৌঁছে জামরাতুল উক্ববায় ‘রামি’– কঙ্কর নিক্ষেপ

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার ঐ পথ ধরে এগুতে থাকলেন যা ‘যামরাতুল উক্ববায়’ গিয়ে পৌঁছেছে। (জামরাতুল উক্ববা– সাধারণ মহলে বড় শয়তান বলে পরিচিত।) সেখানে পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে বসেই ‘জামরাতুল উকবায়’ সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিলেন। ঐ সময় হযরত বিলাল ও হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। একজন তাঁর বাহনের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর অপরজন রোদের তাপ থেকে বাঁচানোর

[১] যাদুল মা‘আদ ২/২৫২-২৫৪, উয়ূনুল আসার ৩/৩৬৩
[২] যাদুল মা‘আদ ২/২৫৪, উয়ূনুল আসার ৩/৩৬৩
[৩] যাদুল মা‘আদ ২/২৫৫,

জন্য কাপড় দিয়ে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন।[১]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের কাজগুলোর অধিকাংশই উটে চড়েই আদায় করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ হিকমত নিহিত ছিল। যাতে তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণ হজের কর্ম আদায়কালে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পান এবং হজের বিধি-বিধান শিখে নিতে পারেন।

'রামি'– কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশ্রামস্থলে চলে গেলেন। তাঁর বিশ্রামের তাঁবুটি ছিল যেখানে বর্তমানে মসজিদে খাইফ নির্মিত হয়েছে সেখানে। সেখানে পৌঁছে তিনি এক খুৎবা দিলেন। মুহাজির ও আনসারদেরকে একত্র করে হজের বিধি-বিধান শিক্ষা দিলেন। আরাফার ভাষণের কিছু কিছু বিষয় পুনর্বার অধিক গুরুত্বসহ উল্লেখ করে বলেন–

> "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের অর্থ (জান-মাল) ও সম্মান একে অপরের জন্য তেমনি সম্মানিত ও পবিত্র, আজকের (আরাফার মহান) দিন এই মহান (মক্কা) নগরীতে ও এই পবিত্র (হজের) মাসে যেমন তোমাদের কাছে সম্মানিত ও পবিত্র।
>
> সত্বর তোমরা তোমাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদের আপন আপন কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না– যে একে অপরের গলায় অস্ত্র চালনা করবে। বল! আমি কি আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? শুনে রাখ! তোমরা যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে (আমার কথা) পৌঁছে দিও।[২]

কুরবানী

দশই যিলহজ্ব। যাকে ঈদুল আযহা বলা হয়। হাজীরা এ দিনকে 'ইয়াউমুন নাহার' (–পশু জবাই এর দিন) বলে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীস্থলে আসলেন এবং একশত উট কুরবানী করলেন। তন্মধ্যে তেষট্টিটি উট তিনি নিজ হাতে জবাই করেন এবং হযরত আলীকে বাকি সাইত্রিশটি

[১] মুসনাদে আহমদ ৭/৫৫০
[২] সহীহ মুসলিম

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

উট জবাই করতে বললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

> ‘মিনার পুরো এলাকাই জবাইস্থল’। অর্থাৎ যেখানেই পশু জবাই করা হোক এতেই হুকুম পালন হয়ে যাবে।

হলক ও মাথা মুণ্ডন

কুরবানীর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা কামিয়ে ফেললেন। তাঁর মাথা কামিয়ে দিয়েছিলেন হযরত মা‘মার ইবনে আব্দুল্লাহ।[১] আদেশ অনুযায়ী প্রথমে তিনি নবীজীর মাথার ডান দিকের চুল কামান। আর চুলগুলো উৎসর্গিতপ্রাণ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তারপর বাম দিক হলক করলেন এবং চুলগুলো হযরত আবু তালহা (রা.) –র হাতে অর্পণ করেন।[২]

তাওয়াফে যিয়ারত

তাওয়াফে যিয়ারতকে ‘তাওয়াফে ইফাজাহ’ ও ‘তাওয়াফে ছদর’ও বলা হয়ে থাকে। এটি হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুক্ন। কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন থেকে ফারেগ হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে বের হন এবং যোহরের নামাযের আগেই ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ আদায় করেন। তিনি এই তাওয়াফ বাহনে চড়েই করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল উম্মতে মুসলিমাকে তাওয়াফের সুন্নত তরীকা শিক্ষা দেওয়া এবং কোথায় কী আমল করতে হয় তা কর্মের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া। এ ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাই উলামায়ে কেরাম বাহনে চড়ে তাওয়াফ করাকে সকলের জন্য সুন্নত আখ্যা দেননি। তবে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা অন্য কোন ওজর থাকে তাহলে তার জন্য বাহনে (বা হুইল চেয়ারে) চড়ে তাওয়াফ করার অনুমতি রয়েছে।

তাওয়াফের পর যমযম পান

তাওয়াফে যিয়ারত থেকে ফারেগ হওয়ার পর সরকারে দু ‘আলম সাল্লাল্লাহু

[১] সহীহুল বুখারী
[২] সহীহ মুসলিম

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযম কূপের নিকট আসলেন। হাজীদের যমযম পান করানোর দায়িত্ব ছিল হযরত আব্বাস (রা.) ও তাঁর সন্তানদের। নবীজীর আদেশে এক বালতি যমযমের পানি তোলা হল। তিনি দাঁড়িয়েই তা থেকে কিছু পানি পান করলেন।

আবে যমযমের ফযীলত ও বরকত

প্রসঙ্গক্রমে মনে হল এখানে যমযমের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু লিখে দেওয়া উচিত। যাতে হজ্ব ও উমরাহ পালনকারীরা এই বরকতময় মহান নিয়ামতের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারে–

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তাঁর স্ত্রী ও নিষ্পাপ শিশুপুত্রকে এই অনাবাদ বিশুষ্ক উপত্যকায় ছেড়ে রেখে গিয়েছিলেন। এটি সেই স্থান বর্তমানে যা মক্কা মুয়াজ্জমার মত এক সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত ও জনবহুল শহরে পরিণত হয়েছে। যখন হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাম পানির সন্ধান করলেন এবং তাঁর শিশুপুত্রটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাঁদতে শুরু করল। তখনই আল্লাহ তা'আলা তার পিপাসা মিটানোর জন্য যমযমের এ পবিত্র প্রস্রবণ (জলধারা) জারি করে দিলেন।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন– আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিয়োগ করলেন যিনি তাঁর আদেশেই প্রস্তরভূমি থেকে এই জল প্রবাহ উৎসারিত করেন। আল্লাহ তা'আলা এ পানিতে খাদ্যের অভাব পূরণযোগ্য উপকরণ রেখে দিলেন।[১]

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন– এ থেকে বোঝা যায় হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাম আবে যমযমকে খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার করতেন যা তার ক্ষুধা ও পিপাসা উভয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।[২]

প্রথম থেকেই এ পানি ছিল বরকতপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর। তবে এতে আরও বেশি বরকত বৃদ্ধি পায় যখন 'সাকিয়ে কাউসার' (– আবে কাউসার বন্টনকারী) হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কূপে কুলি করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] তাফসীরে কুরতুবী ৯/৩৭০
[২] ফাতহুল বারী ৬/৪০৩

ওয়াসাল্লাম যমযম কূপের কাছে আসলেন। আমি কূপ থেকে এক বালতি যমযম উঠালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। অতঃপর তিনি বালতিটিতে কুলি করেন এবং আমি পুনরায় তা কূপে ঢেলে দিলাম।[১]

এভাবেই যমযম পানের মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতেরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখের লালা মুবারকের বরকত হাসিল করতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লালা মুবারকের দ্বারা কয়েকটি 'মু'জিযা'-(অলৌকিক ঘটনা) তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রকাশ পেয়েছিল। হাদীস গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে- খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) এর চোখে সমস্যা ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখে নিজের মুখের লালা মুবারক লাগিয়ে দোয়া করে দিলেন। সাথে সাথে তাঁর চোখের সমস্যা দূর হয়ে গেল। এমন মনে হতে লাগল যেন কোন সমস্যা ছিলই না।[২]

মুসলিম শরীফে হযরত আবুযর গিফারী (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এতে রয়েছে যে, তখন তিনি প্রায় এক মাস পর্যন্ত শুধু যমযম খেয়েই অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি বলেন-আমার কাছে আবে যমযম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই শুধু যমযম পান করতে থাকলাম। এতে করেই আমি পূর্ণ সুস্থ ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে গেলাম। কোন দুর্বলতা অনুভূত হয়নি। যখন নবীজীর কাছে তিনি এ বিবরণ দিলেন তখন নবীজী বলেন-

إنها مباركة إنها طعام طعم.

"এটি বরকতপূর্ণ পানি। এতে খাদ্যের অভাব পূরণের উপকরণ রয়েছে।"[৩]

যমযম যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেবেন। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ماء زمزم لما شرب له.

[১] মুসনাদে আহমদ, ইবনে কাসীর বলেন- সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ)

[২] সহীহুল বুখারী

[৩] সহীহ মুসলিম, আবু যর গিফারী- ফযীলত অধ্যায়

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

> "যে নিয়তেই যমযম পান করা হয় তা-ই পূর্ণ হয়"।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

> যদি তোমরা কোন অসুস্থতা থেকে শিফা লাভ করার নিয়তে যমযম পান কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শিফা দান করবেন। যদি কোন অনিষ্টতা থেকে মুক্তি লাভের নিয়তে পান কর তবে অনিষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করবে। আর যদি পিপাসা নিবারণের জন্য পান কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিপাসা নিবারণ করে দেবেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে অপর বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم.

> "ভূপৃষ্ঠের সর্বোত্তম পানি হল যমযম। এতে ক্ষুধার্থের জন্য খাবারের উপকরণ এবং পীড়িতের জন্য রয়েছে রোগ নিরাময়।"[৩]

যমযম কূপ পৃথিবীর সবচে' পবিত্র ভূখণ্ডে এবং দুনিয়ার সবচে' বরকতময় স্থানে প্রবাহিত। হজ্ব ও উমরাহ পালনকারী এবং সাধারণ ইবাদতে নিরত সকল লোকদের জন্যই বাইতুল্লাহ্‌র নিকটবর্তীস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এ কূপ সৃষ্টি করেছেন। এতেই যমযমের বরকত কিছুটা অনুমান করা যায় যদিও পুরোটা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন–

> আমি এমন লোকদেরও সাক্ষাত পেয়েছি যারা অর্ধ মাসব্যাপী শুধু যমযমকেই খাদ্যউপাদান হিসেবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাদের ক্ষুধার অনুভূতি হয়নি। তারা অন্যান্য লোকদের সাথে

---

[১] সুনাহে ইবনে মাযা, আহমদ, বাইহাকী। দিময়াতী বলেন– এর সনদ হাসান।

[২] আল মুসতাদরাক, হাকেম বলেন– এর সনদ সহীহ, সুয়ূতীও একে সহীহ বলেছেন– আল জামেউছ ছাগীর

[৩] হাইছামী বলেন– বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, সুয়ূতীও একে হাসান বলেছেন।

তাওয়াফও করছেন।[১]

যতদিন যমযম থাকবে ততদিন এর সমুদয় বৈশিষ্ট্যও অবশিষ্ট থাকবে। যেই না আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হল যে, যমযম মানুষের দেহের প্রতিটি অংশের জন্য নেহায়েত উপকারী– তখনই অনেক দুর্বল ঈমানদারেরাও তা গুরুত্বের সাথে পান করতে শুরু করেছে। অথচ একজন মুমিনের জন্য শুধু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীই যথেষ্ট হওয়া উচিত। ঐ পবিত্র সত্তা যাঁর যবান থেকে সত্য বৈ আর কিছুই নিসৃত হয় না। যাঁর সংবাদের সত্যতায় তাঁর নিকৃষ্টতম দুশমনদেরও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যা বলেন তা সত্য ও যথার্থ। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যতা ও নবুওতকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে।

যমযম পীড়িতের জন্য রোগ নিরামক, ক্ষুধার্থের জন্য খাদ্য ও তৃষ্ণার্তের জন্য উত্তম পানীয়। এ বরকতময় পানি যার মিলে যায় তার উচিত তা সুস্থতার নিয়ামত লাভের নিয়তে পান করা। বিশেষত যমযম পান করার সময় ঈমানের সাথে জীবনাবসানের দোয়া করা। কেননা ঈমানের সাথে মৃত্যুর উপরই নির্ভর করে পরকালীন চিরমুক্তি।

তাওয়াফে যিয়ারত পরবর্তী ‘সাঈ’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ্ব ছিল ‘কিরান’। আর হজ্বে কিরান পালনকারীদের দুই বার ‘সাঈ’ করতে হয়। একবার উমরার সাঈ যা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়বার হজের সাঈ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন– তাওয়াফে ‘ইফাজা’ (–তাওয়াফে যিয়ারত) থেকে ফারেগ হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযম পান করেন। অতঃপর সাফায় আগমন করেন এবং সাঈ আদায় করেন।[২]

মিনায় প্রত্যাবর্তন

তাওয়াফ ও সাঈ সমাপ্ত করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনর্বার মিনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন।

---

[১] যাদুল মা'আদ ৬/৩৯৩

[২] সীরাতে ইবনে কাসীর ৪/৩২১

১১ যিলহজের 'রামি'– কঙ্কর নিক্ষেপ

পরদিন ১১ই যিলহজ্ব সূর্য হেলে পড়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামি করেছেন। তিনি পায়ে হেঁটেই 'জামরায়ে উলা' –এর নিকট আসলেন এবং এক এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ হলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত উঠিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করলেন। তৎপর 'জামরায়ে উস্‌তায়'– মধ্যবর্তী স্তম্ভে এভাবেই 'রামি' করলেন ও দোয়া করলেন এবং সবশেষে 'জামরাতুল আক্বাবার' নিকট পৌছে তাতেও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এখানে দাড়িয়ে কোন দোয়া করেননি। বরং 'রামি' শেষ করেই ফিরে গেলেন।[১]

মিনায় নবীজীর দ্বিতীয় খুৎবা

১১ই যিলহজ্ব রোববার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় দ্বিতীয় আরেকটি খুৎবা প্রদান করেন। যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

> "নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক এক, অদ্বিতীয়। তোমরা সকলেই একই পিতা (আদম আলাইহিস সালাম) এর সন্তান। জেনে রাখ! একজন অনারবের উপর একজন আরব সন্তানের (স্বতন্ত্র) কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি একজন অনারবেরও আরবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (অর্থাৎ তোমরা সকলেই এক আল্লাহর বান্দা এবং এক আদমের সন্তান। বংশ ও গোত্রের কারণে কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।) অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণ লোকের উপর লালবর্ণ ব্যক্তির কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তদ্রুপ লালবর্ণ ব্যক্তির উপর কালোবর্ণ ব্যক্তিরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবল তাকওয়া ও খোদাভীতি ছাড়া। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একটিমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া ও খোদভীতি।) সন্দেহ নেই আল্লাহর দরবারে তোমাদের মধ্য হতে সবচে' সম্মানিত সেই, যে সর্বাধিক পরহেজগার। (অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে ও গুনাহ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে।)

[১] যাদুল মা'আদ ২/২৮৫

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> বল আমি কি বার্তা পৌঁছে দেইনি? উপস্থিত সকলে উত্তর দিলেন– অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল আপনি বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। নবীজী বলেন– যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দেবে।[১]

মিনায় অবস্থানকালে রাতে মক্কায় আগমন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন– মিনায় অবস্থানকালে প্রতি রাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের কোন এক সময় মক্কা মোকাররামায় যেতেন।[২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া ত্যাগের ইঙ্গিত

সূরাতুন্ নছর এর অবতরণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়েই সূরায়ে নাছর– (إذا جاء نصر الله) অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বুঝে নিলেন যে, এতে তাঁর দুনিয়া ত্যাগের পয়গাম রয়েছে। এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর তিনি তাঁর উটের পিঠে চড়ে একটি ভাষণ দেন। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।[৩]

১২ ও ১৩ যিলহজে 'রামি'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজের বার তারিখ সূর্য ঢলে যাবার পর রামি করেন এবং এরপর মিনাতেই অবস্থান করেন। তদ্রূপ যিলহজের তেরো তারিখেও সূর্য ঢলে যাবার পর রামি করেন। এরপর মিনা থেকে যাত্রা করে আব্‌তাহ পৌঁছান। এ স্থানের অপর নাম মুহাছ্ছাব। এখানে জনৈক সাহাবী তাঁর জন্য একটি তাবু তৈরী করেছিলেন। তিনি তাতেই অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এবং কিছু সময় বিশ্রাম করেন।[৪]

---

[১] আততারগীব ওয়াত তারহীব

[২] সহীহুল বুখারী, সনদ বিহীন তা'লিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[৩] বাইহাকী ৭/৩৩০

[৪] যাদুল মাআদ ২/২৯০

MUASSASA

বিদায়ী তাওয়াফ

অতঃপর রাতের কোন এক সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামায় আগমন করেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ করেন।[১] এ তাওয়াফে তিনি রামাল করেননি।

মদীনা তায়্যিবার পথে

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জামার নিম্নাঞ্চল দিয়ে মদীনা তায়্যিবার দিকে রওয়ানা করলেন, যাকে 'কুদা' (كُدى) বলা হয়।[২] নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হজ্বে প্রায় এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পূণ্যবান সাহাবীদের সামনে তাওহীদের শিক্ষা এবং হক্ব এর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর মদীনা তায়্যিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যেহেতু তিনি এ হজ্বে উম্মতের মাঝে শেষ পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন তাই এর নাম হয়েছে 'হাজ্জাতুল বালাগ' (–বার্তা পৌছানোর হজ)।

এ হজ্বে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নতকে পুনর্জীবন দান করেছেন। শিরকী রুসম-রেওয়াজ খতম করেছেন। প্রকৃত তাউহীদের প্রচার দিয়েছেন। বর্ণ ও বংশগত পার্থক্যকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং তাকওয়া অর্জন করার হুকুম করেছেন। স্ত্রীদের সাথে ভাল আচরণ ও উত্তম ব্যবহার করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল উম্মতের পক্ষ থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

গাদীরে খুম এর খুৎবা

কাফেলা মদীনার পথে 'রাবেগ' এর নিকট গাদীরে খুম নামক স্থানে পৌঁছল। তখন হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) নবীজীর সামনে হযরত আলী (রা.) এর উপর কিছু অভিযোগ আরোপ করলেন। (অভিযোগ ছিল– হযরত আলী (রা.) কর্তৃক ইয়ামানে গনীমতের মাল বণ্টন বিষয়ক।) মূলত এ অভিযোগ উঠেছিল হযরত বুরাইদা (রা.) এর বুঝের ক্রুটির কারণে। অর্থাৎ মূল বিষয়টি তিনি

[১] বিদায়ী তাওয়াফ শুধু আফাকী তথা যারা মীকাতের বাহির থেকে আসে তাদের জন্য করা ওয়াজিব।

[২] যুরকানী ৮/২১২

পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। অভিযোগের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে একটি ভাষণ দিলেন। এতে আহলে বাইতের (নবী পরিবারের) শান ও মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং তাদের হক ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান থাকার আদেশ করলেন।[১]

উমরের পক্ষ থেকে হযরত আলীকে মোবারকবাদ

গাদীরে খুম এর খুৎবা শোনার পর হযরত উমর ফারুক (রা.) এমন মর্যাদা লাভ করার জন্য হযরত আলীকে মোবারকবাদ দিলেন। এ থেকে বোঝা যায় সাহাবীদের মধ্যে পরস্পরে সীমাহীন ভালবাসা এবং আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল। আর তা হবে নাই বা কেন? কুরআন মজীদ সাক্ষী দিচ্ছে—

مُّحَمَّد رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُم

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন (অর্থাৎ সাহাবীগণ) তারা কাফেরদের জন্য বড় কঠোর এবং পরস্পরের মাঝে বড় দয়াবান"। [সূরা আল-ফাত্হ ২৯]

হযরত আলীর বিষয়ে অভিযোগদাতা বুরাইদা (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভাষণ শোনার পর থেকে হযরত আলী (রা.) এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর অনুসরণ করাকে নিজের জন্য ফরজ বানিয়ে নিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি (আলী রা. এর পক্ষে) জামালের যুদ্ধে শহীদ হন।[২]

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

যুল-হুলাইফায় রাত্রি যাপন

যুল-হুলাইফায় পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত ছিল। যুল-হুলাইফায় (—আবইয়ারে আলীতে) পৌঁছে রাত যাপন করেন। এটি মদীনায়ে তায়্যিবা হতে কয়েক

[১] সহীহ মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়, ফাযায়েলে আলী

[২] মনে রাখতে হবে, আয়েশা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আলী (রা.) এর মাঝে মিলিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা এটিকে একটি যুদ্ধের রূপ দিয়ে দেয়। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) উটে আরোহিত ছিলেন তাই এর নাম 'জংগে জামাল'। এর পর থেকে হযরত আয়েশা সবসময় তাঁর এ সফরের জন্য আফসোস করতেন। হযরত আলী (রা.) ও আম্মাজান আয়েশার ইজ্জত-সম্মানে ও তাঁর প্রতি সুধারণা রাখায় কোনরূপ ত্রুটি করেননি। সকল সাহাবীদের ভালবাসা ও তাঁদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর এটিই মদীনাবাসীর ইহরামের 'মীকাত' – তথা ইহরাম বাঁধার শেষ স্থান। এখান থেকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছিলেন।

মদীনা তায়্যিবা দেখা মাত্র আনন্দ প্রকাশ

পরদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তায়্যিবার উদ্দেশ্যে যুল-হুলাইফা থেকে যাত্রা করলেন। যখন মদীনার লোকালয় দৃষ্টিগোচর হল তখন তিনি ভীষণ আনন্দিত হলেন। তাঁর পবিত্র আদত ছিল– মদীনা দৃষ্টিগোচর হলেই বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতেন। মূলত এটি ছিল মদীনার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ।

যখন মদীনার উপর দৃষ্টি পড়ল তখন তিনি তিনবার আল্লাহু আকবার বলে নিম্নের বাক্যগুলো বললেন–

لَا إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আধিপত্য তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা আমাদের রবের দিকেই প্রত্যাগমনকারী। তার কাছেই ফিরে আসি (তাঁরই ইবাদত করি।) আর তাঁকেই সিজদা করি তাঁর স্তুতি গাই। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। (কাফেরের) সব দলগুলোকে তিনিই পরাজিত করেছেন"।[১]

আর এভাবেই 'হাজ্জাতুল ওয়াদা' তথা বিদায় হজ্জের সফর পূর্ণ হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে তায়্যিবায় ফিরে এলেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া তিনি তাঁর এ অধম বান্দাকে এ পবিত্র বিবরণ লেখার তাউফিক দিয়েছেন এবং তাও মোটামুটি বিশদ আকারেই হয়েছে।

فله الحمد والشكر، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أُنيب.

[১] যাদুল মা'আদ ২/৩৩০

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ এর দীনী-দাওয়াতী কাজে আপনিও শরীক হতে পারেন

ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ-র অলাভজনক প্রতিষ্ঠান মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ। বিস্তৃত পরিসরে দীনী-দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞ আলিমদের নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরাসরি অংশগ্রহণ করে কিংবা আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে মুআসসাসার দীনী কাজে আপনিও শরীক হতে পারেন।

যে সকল খাতে অনুদান দিয়ে শরিক হওয়া যাবে—

ক. গবেষণামূলক আরবী-বাংলা, দীনী ও দাওয়াতী কিতাব প্রকাশ ও বিতরণের জন্য অনুদান পাঠিয়ে
খ. প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র (ছোট পুস্তিকা) প্রকাশ ও বিতরণ করে
গ. শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে
ঘ. মুআসসাসার মাসিক ব্যয়ভার বহনে অংশগ্রহণ করে।

অনুদান পাঠানোর মাধ্যম

১. ব্যাংক একাউন্ট

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বিডি
চলতি হিসাব নং ০২৪১৩৩০০২২৬৭২
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তরা শাখা, ঢাকা-১২৩০

২. বিকাশ, রকেট ও নগদ

+880 1871-746798

সেন্ড মানি করতে বিকাশ অ্যাপ দিয়ে QR কোডটি স্ক্যান করুন

আমাদের সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন

mibd.org

/ MuassasaIlmiyahbd

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

	বই	লেখক
১	ঈমানের দাবি	মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ
২	কোরআন-সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি	মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ
৩	নবীজির জন্মতারিখ ও ঈদে মীলাদুন্নবী	মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
৪	হায়াতুল আম্বিয়া	মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
৫	তিন মনীষীর জীবনকথা	মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
৬	কিতাব পরিচিতি প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি	মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব
৭	এক ঝলকে কুরআন কারিম	মাওলানা রাশেদুর রহমান
৮	যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম	মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
৯	কুরবানী গাইডলাইন	মাওলানা শিহাব সাকিব
১০	হজ গাইডলাইন	মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব
১১	উমরা গাইডলাইন	মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব
১২	হানাফী মাযহাব : প্রাসঙ্গিক আলোচনা	মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খান
১৩	সমর্পণের পদাবলি	রায়হানা বিনতে আরিফ রাব্বানী
১৪	মুকাদ্দিমাতে নুমানী-১	আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.
১৫	ইকরা কায়দাহ	মাওলানা আব্দুস সামাদ মাওলানা আব্দুল আহাদ
১৬	কিফায়াতুল মুগতাযী (১ - ৮ খণ্ড) كفاية المغتذي في شرح جامع الترمذي	মাওলানা আব্দুল মতীন
১৭	الدرر الثمينة في مصطلح السنة	মাওলানা আব্দুল মতীন
১৮	كلمات عن أخبار الشيخ محمد عبد المالك الكملائي	মাওলানা আবু সায়েম
১৯	الاعتبار بما ورد في ليلة النصف من شعبان من الآحاديث والآثار	মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
২০	علماء ديوبند نماذج من حياتهم الدينية والعلمية	শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী